“প্রমীলা” ও “সীতা” (মেঘনাদ বধ কাব্য) চরিত্র চিত্রনে মধুসূদনের মানস প্রতিফলন

নসিমা পারভীন
সহকারী অধ্যাপক
আই ই আর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
Email: prof.zahurul1970@cu.ac.bd

[প্রতিপাদ্য সারঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রথম কবি। উনিশ শতকের বাঙালী নব জাগরনের মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত মধুসূদন বাংলা সাহিত্য নবযূগের সূচনা করেছেন। বস্তুতঃ উনিশ শতকের নব-জাগরনের ফলে বাংলাদেশে তথা বাঙালী সমাজে দেখা দিয়েছিল নারীর স্বতন্ত্র সত্তা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে উপলদ্ধি ও স্বীকৃতি। মধুসূদন জীবনে ব্যক্তিত্বের সাধনা করেছেন এবং নারীর মধ্যে এই ব্যক্তিত্বের শ্রদ্ধা করেছেন। তাঁর মহাকাব্য, পত্র কাব্য, কাব্য সমূহে তিনি ব্যাক্তিত্বময়ী নারীর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, বাংলা সাহিত্য ধারায় যা অভিনব। কবি ও কবিমানস এ দুটি বিষয় পরিপূরক বলে বিশেষজ্ঞদের মত। এই বিষয়টিতে মেঘনাদবধ কাব্যে’র প্রধান দুটি নারী (প্রমীলা ও সীতা) চরিত্র নির্মানে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবি মানস কিরূপ প্রতিফলিত হয়েছে এই প্রবন্ধে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।]

[Abstract: Michael Madhusudhan Dutt is the first poet of the modern age of Bangla literature. Madhuaudhan, highly inspired by the theme of 19 century Bengali revival, has initiated a new era in Bangla literature. In fact, owing to this revival in the 19 century, a realization and recognition about women's individual entity and personality was observed in Bangladesh i.e. in Bangalee society. Madhusudan was devoted to the personality in human life and paid special homage to this personality in the life of the women. In his epic and other forms of literature, Madhusudhan tried to highlight the dignity of the enlightened women with personality and thus, he had set an amazing trend in Bangla literature. Scholars opined that both the poet and the poetic entity are complementary. This essay has endeavoured to demystify how far this poetic entity has been reflected in creating two main female characters (Promila and Seeta) in his epic Meghanadbadh Kabya.]

Keywords: ভূমিকা, আধুনিকতা ও মধুসূদন, নারী চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদনের দৃষ্টিভঙ্গী, মেঘনাদ বধ কাব্যের “প্রমীলা”, বঙ্গালী প্রাণতা ও “সীতা” চরিত্র নির্মান।

ভূমিকা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুগ স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বলা হয়ে থাকে বাংলা সাহিত্যের রূপকার ও পথিকৃৎ। তাঁর হাতেই বাংলা সাহিত্যের শক্ত ভিত তৈরি হয় এবং নতুন করে বাংলা সাহিত্য বিশ্ব দরবারে পরিচিতি লাভ করে। যুগ স্রষ্টা বিষয়টি নিয়ে যে বিষয় সমূহ চিহ্নিত করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য দিক হলো তিনি পশ্চিমা ধারাকে বাংলা সাহিত্যে ব্যবহার করে সাহিত্যের মূল ধারায় প্রবেশ করিয়েছেন আর আমাদের সাহিত্য ভাবনা কে, করেছেন বিশ্ব বিস্তৃত। এখানেই মধুসূদন এর কাব্যে আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়

আধুনিকতা ও মধুসূদন

“আধুনিকতা বিষয়টি স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ড. হুমায়ুন আজাদ বলেন “ মানুষ যখন যুক্তিতে আস্থা আনে, যখন সে আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে যখন সে মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করে, তখন সে হয়ে উঠে আধুনিক”।[1] উনিশ শতকে সাহিত্যের সমান্তরালে জ্ঞান বিজ্ঞানের বহুমাত্রিকতা দেখাদেয় প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর এর সব কিছুর প্রভাব পড়ে সাহিত্যে। মহাকাব্য, ট্রাজেডি, প্রহসন, সনেট, সার্থক উপন্যাস, সমালোচনা বিদ্রপাত্মক প্রবন্ধ ইত্যাদি মধ্যযুগের সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে চুরমার করে নতুন যুগের সূচনা করে। আর এ সকল সৃষ্টির স্বার্থক স্রষ্টা মধুসূদন। আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক অমূল্যধন বন্দোপাধ্যায় বলেন, “ আধুনিকতা বলতে আমরা যাহা বুঝি তাহা যে পূর্বে কখনই দেখা যায় নাই তাহা নহে। বস্তুতঃ সাহিত্যে প্রাচীন সনতান বা আধুনিক বলিলে বর্ণনার একটা ঐতিহাসিক কাল উল্লেখ করা হয়না, তাহার একটা বিশিষ্ট রীতি, ভাব ও আদর্শ নির্দেশ করা হয়।“ এই বক্তব্য অনুসারে রামায়নে উল্লেখিত ঋষি জাবালি’র কথা বলা যায়-নিজস্ব অনুভূতি ও তীক্ষ্ণধী আশ্রয় করে তিনি নতুন করে জীবন দর্শন গড়েন, প্রচলিত ভাবধারা চিন্তাপদ্ধতি ও দর্শন মেনে নেননি। প্রতিটি কালে এ রূপ কিছু আধুনিক মানসিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমের দার্শনিক কবি লরিয়েটস এবং প্রাচীন পারস্যের বৈজ্ঞানিক কবি দার্শনিক ওমর খৈয়ামের রচনার আধুনিকতা গুণ পাঠককে একই সাথে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত করে। অতএব অমূল্যধনের বক্তব্য মেনে নিয়ে বলতে পারি “ আধুনিকতাকে কোন একটা ঐতিহাসিক যুগের বিশিষ্ট, লক্ষণ মনে না করিয়া তাহাকে মানব মনের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত হইবে”।[2] অমূল্য বন্দোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য সম্পর্কে অনেক পন্ডিত ব্যাক্তি দ্বি-মত পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ডঃ আবুল কাশেম ফজলুল হক আধুনিকতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, আধুনিকতার উল্লেখ্যযোগ্য লক্ষণ “বিদ্রোহ”।[3] রোমান্টিক যুগের নতুন পথ চলা শুরু হয়েছিল এই বিদ্রোহের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে ড. অমূল্য বন্দ্যোপাধ্যয়ের বক্তবাটি হচ্ছে “অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায়”- বিভিন্ন দ্রষ্টব্য মতে প্রত্যেকের উপলদ্ধিই সত্য; তবে তা আংশিক বা সীমাবদ্ধভাবেই সত্য ব্যাখ্যা বা যুক্তি বিভিন্ন রকম হতে পারে তাবে মাইকেল মধুসূদনের ক্ষেত্রে “বিদ্রোহ” ভাবটি যথার্থ। মধুসূদনের জীবনাচরণ, রচনার বিষয় ও পদ্ধতি, চরিত্র চিত্রণ প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ ভাব সু-স্পষ্ট । এই প্রসঙ্গে “মেঘনাদ বধ” মহা কাব্যের প্রধাণতম দুই নারী চরিত্র

---

[1] লাল নীল দীপাবলী/ ড: হুমায়ুন আজাদ/পৃ:২৪

[2] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস/ অধ্যাপক অমূল্যধন বন্দোপাধায় পৃ:৬২.

[3] আধুনিকতা বাদ ও জীবনানন্দের জীবনোৎকণ্ঠা/ আবুল কাশেম ফজলুল হক, পৃ: ২.

"প্রমীলা" ও "সীতা" আলোচনা করে মধুসূদন মানস কীভাবে এ দুই চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে তা উপস্থাপন করছি। জীবন সত্যকে প্রকাশ করাই সাহিত্যের কাজ। সাহিত্যের উপাদানই হলো মানব জীবনের বাস্তবতা। "জীবন-সত্য" নিয়ে মত বিরোধ থাকলেও এটি সাহিত্যের এক অ-বিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে উল্লেখ্য যে সাহিত্য সাংসারিক তথ্যের অনুসরণ, অনুকরণ বা ব্যাখ্যা নয়; এটি লেখকের ধ্যানলব্ধ এক অভিনব সৃষ্টি, জাগতিক তথ্য সেই ধ্যানকে রূপায়িত করার পক্ষে অন্যতম সহায়ক মাত্র । এ সকল বিবেচনাতেও মাইকেল মধুসূদন দত্ত আধুনিক। নিজের সম্পর্কে বন্ধু রাজ নারায়ণ বসু- কে মাইকেল লিখেছিলেন-"বন্ধু রাজ তোমাকে আমি হলপ করে বলতে পারি আমি দেখা দেবো একটা বিশাল ধুমকেতুর মতো এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই"।[4] ঊনিশ শতকের নব জাগরনের মানসপুত্র, মধুসূদন সমসাময়িক সমাজের তুলনায় ছিলেন অভিনব, আচার আচরনে তার অতি আধুনিকতা সে সময়ে ছিল উদ্ধত, সনাতন মূল্যবোধের প্রতি অবজ্ঞা, জীবন ও সাহিত্যের প্রচলিত রীতি নীতির প্রতি বিদ্রোহ এ সবই তাকে চার পাশের জনতা থেকে ভিন্নতর করেছে। ছাত্র জীবন থেকে নিষিদ্ধ খাবার খেয়েছেন, নিষিদ্ধ পানীয়তে ছিলেন আসক্ত, পোশাক আশাকে নিজের স্টাইল নির্ধারন করেছেন ফিরিঙ্গিদের অনুকরনে, সনতান রুচি অনুয়ায়ী "পরীর মতো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে"- এখবর শুনে আহ্লাদে আটখানা হননি বরং আধুনিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী নারী ব্যক্তিত্ব তাকে আকৃষ্ট করেছে। নিজ ধর্ম ত্যাগ করেছেন, বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে সেই যুগে দু'জন শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে পারিবারিক জীবন কাটিয়েছেন। ডেপুটি হওয়া যে কালে ছিলো চরম আকাঙখা,সেকালে তার ধ্রুব লক্ষ্য ছিলো কবি হওয়া। যে সময়ে বাঙালিরা অহংকারে ফেটে পড়তেন সদর দেওয়ানি আদালতের উকিল হয়ে, সেই কালে কেবল ব্যারিস্টার হবার উদ্দেশ্য নিয়ে বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বিলেত গেছেন। সময়ের তুলনায় অর্থ উপার্জন করেছেন প্রচুর, কিন্তু তা দিয়ে সাধারণ মানুষের মতো ধন-সম্পদ জমা করেননি। দু'হাতে তা উড়িয়েছেন, সে সময়ে বিষয়টি ছিল তাক লাগানোর মতো উদাহরণ। এ প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ বলেছেন- " তার এই অ-সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারনে সে সময়ের কেউ তাকে ঘৃণা করেছেন , কেউ ভালোবেসছেন, করুণাও করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি কেউই"।[5]

নারী চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদনের দৃষ্টিভঙ্গী

মধুসূধন জীবনে ব্যক্তিত্বের সাধনা করেছেন এবং নারীর মধ্যেও এই ব্যাক্তিত্বের শ্রদ্ধা করেছেন। নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও রচনায় তার এই মনোভাব প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ উনিশ শতকের নব-জাগরনের ফলে বাংলাদেশ তথা বাঙালি সমাজে দেখা দিয়েছিল নারীর সতন্ত্র সত্তা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে উপলদ্ধি ও স্বীকৃতি। মধুসূদন ছিলেন উনিশ শতকের নব জাগরনের মানস পুত্র সর্বজনের এই স্বীকৃতির পরও সনাতন বাঙ্গালী-প্রানতার প্রভাব মধুসূদন এড়িয়ে যেতে পারেন নি। নারী চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদন দুটি বৈপরীত্বের সমন্বয় সাধন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। অধিকার সচেতন, আত্মমর্যদা বোধ, বর্হিজগতে চলাফেরায় দ্বিধাহীন এমন একটি কাঠামোতেই তিনি নারী চরিত্র কল্পনা করেছেন আবার স্বভাব ধর্মে ভারতীয় নারী বৈশিষ্টে তিনি স-বিশেষ অনুগত। মধুসূদন অঙ্কিত যে কোন নারীর চরিত্রের মধ্যেই দেশি ও বিদেশি বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান। যা পাঠক মনে ভাবনার উদ্রেক করে।

মধুসূদনের মহাকাব্য "মেঘনাদ বধ" এ প্রধান নারী চরিত্র প্রমীলা" ও "সীতা", এ দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে আধুনিক নারী চরিত্র নির্মাণে মধুসূদনের মনোভাব সু-স্পষ্টতা পেয়েছে। ঊনিশ শতকের মধ্যাহ্নে নবজাগরণের আলোক ধারায় স্নাত মধুসূদন "প্রমীলা" চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নারী মুক্তির বাণী ঘোষণা করেন।

মেঘনাদ বধ কাব্যের "প্রমীলা"

বিজ্ঞজনেরা বলেন "প্রমীলা" বাংলাদেশে, বাংলা কব্যে নারী মুক্তির অগ্রদূতী, এক প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী। "প্রমীলা" চরিত্র সৃষ্টির অনুপ্রেরণা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। সর্ব সম্মতভাবে বলা যায় অভারতীয় সূত্রে হেক্টর পত্মী অ্যান্ড্রোমেকী ও ট্যাসোর কাব্যের নায়িকা আর্মিডা (জেরুজালেম উদ্ধার) র প্রভাব রয়েছে "প্রমীলা" চরিত্রটিতে। এছাড়া ভারতীয় সাহিত্যের, রঙ্গঁলাল বন্দ্যো◌াপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান এর রাণী দূর্গাবতী' ও সিপাহী যুদ্ধেয় নায়িকা ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর প্রভাব পাওয়া যায় প্রমীলা চরিত্রে। এ সমস্ত প্রভাব স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় মধুসূদনের নিজস্ব সৃজনশক্তি বলে প্রমীলা চরিত্রটিকে জীবন্ত মনে হয়।

মেঘনাদ বধ কাব্যে মাত্র চারটি সর্গে প্রমীলা চরিত্রটির বিস্তার দেখা যায়। প্রথম সর্গে উন্মেষ, তৃতীয় ও পঞ্চম সর্গে বিকাশ এবং নবম সর্গে পরিণতি, এই তিনটি পর্যায়ে চরিত্রটির নির্মাণ দেখা যায়। আবার প্রমিলা চরিত্রটির তিনটি সত্তা প্রেমময়ী , কুলধর্মাচরণী এবং বীরঙ্গঁনা এই ত্রি-সত্তার সমন্বয়েই আদর্শ পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছেন প্রমীলা। তবে এই সবের মূল ভিত্তি তাঁর গৃহী-সত্ত্বা । প্রমীলা চরিত্রের স্বতন্ত্র্যবোধ আভা ছড়িয়েছে ঠিকই তবে কুল বধুত্বের অবস্থান মাহাত্মেই চরিত্রটি বিশিষ্ট্যতা পেয়েছে।

রাবন শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই
সখী, ভিখারী রাঘবে,

শ্বশুর ও স্বামীর পরিচয়ে বলিষ্ঠ প্রমীলার গৃহী সত্ত্বা।

আত্ম বিশ্বাসী, সচেতনতা প্রমীলা চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে প্রমীলা চরিত্রটি ত্রি-স্তরিক এবং এই ত্রি-স্তরের মূলভিত্তি গৃহী-সত্ত্বা তবুও কুলধর্মের সীমা রেখা প্রমীলা চরিত্রের ঐশ্বর্যকে সীমাবদ্ধ করে রাখেনি।

"আধুনিক যূথবদ্ধ যৌথ জীবন নারী পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত, দু'জন কেউ কারো অধীন নয় বরং পরিপূরক- এই ধারণা থেকেই প্রমীলার প্রতি মেঘনাদের ভালবাসা আবেগ বিহবল হলেও অন্ধ নয়। মেঘনাদ প্রেমময় তবে কর্তব্য বিমূখ নয়। মেঘনাদ চরিত্রটিতে হৃদয়বৃত্তি ও কর্তব্য নিষ্ঠার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে যা আধুনিকতার লক্ষণ। 'মেঘনাদ' পিতার কাছে যুদ্ধ

---

[4] আশার ছলনে ভুলি/ গোলাম মুরশিদ/ পৃষ্টা-১৩.
[5] আশার ছলনে ভুলি/ গোলাম মুরশিদ/ পৃষ্টা-১৬

যাত্রার অনুমতি নিয়ে প্রমীলার প্রতি আশ্বাস বানী দিয়ে গেছেন,

ইন্দ্র জিতে জিতি তুমি সতি
বেধেছ যে দৃঢ বাঁধে কে পারে
খুলিতে সে বাঁধে?
ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া কল্যানি
সমরে নাকি তোমার কল্যাণে রাঘবে।

কর্তব্যের সাথে প্রেম ও সম্মান বোধের নিবিড় সাযুজ্য আছে বলেই প্রমীলা ও মেঘনাদের সম্পর্ক প্রেমময় ও মনোহর। স্বামী পরিবার দ্বারা নিপীড়িত নয়। স্বামীর প্রতি অধিকার, প্রেম, আপন ইচ্ছার বাস্তবায়ন, নিজের সত্তা সম্পর্কে সচেতন প্রমীলা আধুনিক নারী জার্গরণের পথিকৃত।

প্রমীলা চরিত্রটিতে অন্তরধর্মের তেজোদীপ্ত প্রকাশ ঘটেছে, যা প্রেমের সহজ সরল লৌকিক মূর্তিকে ভেদ করতে পেরেছে, চরিত্রটির সাবলিলতা পাঠকে আকৃষ্ট ও চমৎকৃত করে ।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলার প্রদীপ্ত উক্তির মাধ্যমে তার আত্মমর্যাদা সম্পন্ন চরিত্রের কথা পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চম সর্গে কুল অঙ্গনার পরিচিতি কিছুটা প্রকাশিত। যুদ্ধ যাত্রার উদ্দেশ্যে প্রভাতের সূচনায় মেঘনাদ যখন মন্দোদরীর চরণ পূজা সম্পন্ন করে তাঁর আর্শীবাদ প্রার্থনা করতে গেছেন, তখনও প্রমীলা তাঁর অনুগামিনী। দেশ রক্ষায় দায়বদ্ধ পুত্রকে বিদায় দিয়ে মা মন্দোদরী বেদনা কাতর হয়ে পুত্রের অংশভাগিনী, পুত্রবধূকে কাছে ধরে রেখে তার মনস্তাপ কাটাতে চেয়েছেন। এই মুহূর্তটিতে প্রমীলার গৃহগত অবস্থানের আপরিহার্যতা স্পষ্ট হয়েছে। লঙ্কার পাটরাণী মন্দোদরীর এই বন্ধন ইচ্ছা প্রেম তৃষাতুরা প্রমীলার মধ্যে ব্যক্তিক্ষুন্নতা তৈরী করেছে, আর তার প্রকাশভঙ্গী গৃহ-ব্রত ধারণায় অভিনব। তবে এই ক্ষুদ্র পরিসরে এই উপলদ্ধি প্রকাশ পাঠক মনকে সন্তুষ্ট করে না। ঔচিত্য বোধ ছাপিয়ে চরিত্রের নিজস্ব প্রকাশিত না হলে, নিজস্বতাকে উপস্থাপিত না করতে পারলে চরিত্র গঠনে অনন্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কারণে আমরা বলতে পারি প্রমীলা চরিত্রটি দ্বি মাত্রিক। দ্বি-মাত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রেমময়তাই এই চরীত্রের নৈমত্তিক রূপ বলে মনে হয়। প্রেমময় রূপেই মেঘনাদের সাথে যৌথতায় প্রমীলা সুদৃঢভাবে বাঁধা। আবার প্রমুক্ত তেজ,তীব্র মর্যাদাবোধ ও অধিকার জ্ঞান এ সকল ই তাঁর চরিত্রে নিহিত প্রমীলা চরিত্রেরই অন্তরঙ্গঁ অংশ যা সর্বত্র প্রকাশিত নয়, অনেকটা গোপন লুক্কায়িত সম্পদের মত। “মেঘনাদ বধ” কাব্যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমিলা চরিত্রের উক্ত গুণাবলী উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত, চকিত দ্যোতনার মতোই আমরা তা প্রত্যক্ষ করি। বিদ্যুাতের ঝলকানির মতো, কাব্যের আয়োজিত আবহের সঙ্গে এই ক্ষণিক প্রকাশ এতই প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ যে, বিষয়টি গুরুত্বহীন বলে মনে হয় না। প্রমীলা চরিত্রটি পাঠে সামগ্রিক বিষয়ে পাঠক মনে প্রশ্ন জাগে যে ‘ প্রমীলার’ দুই রূপের মধ্যে কোনটি তার মূল অংশ- “প্রেম” নাকি “বীর্যবত্তা”। এই প্রশ্নটির যথাযথ জবাব দিয়েছিলেন কবি ও সমালোচক মোহিত লাল মজুমদার, তিনি মেঘনাদ বধ কাবেব্যর সমালোচনায় বলেছেন “প্রমীলা বীরাঙ্গঁনাও নয়, লজ্জাশীলা কুলবধুও নয়, সে পতিগতপ্রানা নারী, অর্থাৎ প্রেমিকা।”

“প্রমীলা” চরিত্রটি প্রেমময় সৌন্দর্যপ্রতিমা করে গড়াই হয়তো মধুসূদনের ইচ্ছা ছিল, সেক্ষত্রে তার বীরাঙ্গনা বৃত্তিকে সহযোগী উপাদানের স্থানে রেখে বিচার করলে চরিত্র ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ হবে বলে মনে করছি। এক আশ্চর্য রহস্যময় সূত্রে প্রমীলা চরিত্রটি দুই বিপরীত ভাব নিয়ে পাঠক মনে গেঁথে আছে।

প্রমিলা চরিত্র সৃষ্টিতে কবির অন্তরঙ্গ একান্ত ব্যক্তিগত কিছু সম্পৃক্ততা স্বাভাবিক ভাবেই থাকতে পারে। মধুসূদনের রোমান্টিক সৌন্দর্য ও বিস্ময়বোধে প্রমিলা চরিত্রটি চিত্রিত হয়েছে। প্রমীলার সৌন্দর্য ও প্রেম কবির তন্ময় রোমান্টিকতার প্রকাশ।

প্রথম সর্গের শুরুতে পাঠক প্রত্যক্ষ করে “ আশ্রিতা, প্রণয় লতিকা প্রমীলা” চরিত্র। এই অংশে রাধার আদর্শের সঙ্গে প্রমীলার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বিরহ মার্গে নিক্ষেপিত প্রমীলা। সখী বাসন্তী প্রমীলাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে “কুসুম চয়ন করে মালা রচনার মাধ্যমে”। প্রমীলা আগত নিশার আক্রমন ভয়ে বিরহ কাতর, অধৈর্য, নিঃসঙ্গ রাত্রির হাত থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে স্বামী সান্নিধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, শত্রু পক্ষ রাঘবীয় বেষ্টনী অতিক্রম করতে চেয়েছেন অসীম সাহসে।

সখী বাসন্তি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় দুধর্ষ শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত লঙ্কাপুরীতে প্রশে করা সহজসাধ্য নয়। বাসন্তীর এই কথার প্রেক্ষিতে প্রমীলার প্রদীপ্ত উক্তি নির্ভীক আত্মমর্যাদা সম্পন্ন চরিত্র যেন চকিত অগ্নুৎপাতে সঞ্চিত তেজ উদগরীত হয়ে তাকে নূতন এক পরিচয়ের মানদন্ডে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

পবর্ত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তবে গতি?
দানব নন্দিনী আমি, রক্ষ কুল বধু
রাবন শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই সখী, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ বলে দেখিব কেমনে মোরে
নিবারে নৃমণি?

উনিশ শতকের প্রথম আধুনিক কবি নারীকে সবল শক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছেন। এখানে সহজাত ভাবে প্রসঙ্গটি এমন যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ধারাবাহিত উদাসীন্য ও অবহেলার দায় মেটানোর জন্য প্রমীীলা শ্রেণীগতভাবে প্রস্তুত হতে চাইছেন- বিষয়টি এমন নয়। এ প্রসঙ্গে “ চিত্রাঙ্গদা”র কথা বলা যায় যে চিত্রাঙ্গদা এরকম অভিজ্ঞতার ভাগী ছিলেন। চিত্রাঙ্গদা প্রকাশ্য রাজসভায় বলেছেন, মর্যদাশূন্য স্বামী প্রেমহীন জীবন তাঁর। রাবনের আয়োজিত যুদ্ধে একমাত্র অবলম্বন পুত্র বীরবাহুকে হারিয়েছেন।

হিন্দু সামাজিক প্রথা অনুযায়ী স্বামীর অনাদরকে নিরবে সহ্য করাই পতিব্রত্যের নিয়ম। সেই নিয়মের বাধা ডিঙ্গিয়ে স্বামীকে অভিযুক্ত করেছেন, প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন চিত্রাঙ্গদা। রাবনকে অভিযুক্ত করেছেন লঙ্কা যুদ্ধকে রাবনের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ বলেছেন। “হায় নাথ, নিজ কর্মফলে/মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।” বলা যায়, রাবন পত্নী চিত্রাঙ্গদা মধুসূদনের নারী কল্পনার প্রথম খসড়া চরিত্র, ‘প্রমীলা’তে যা পূর্ণতা পেয়েছে। প্রমীলা’র প্রতিবাদী

বৈশিষ্ট্য চিত্রাঙ্গদার প্রতিবাদী স্বরূপ এক নয়। "প্রমীলা'র চকিত বিরাঙ্গনা ভার তাঁর প্রেম দশারই একটি মার্গীয় রূপ- মোহিত লাল মজুমদার।

ভারতীয় কাহিনীর সাবিত্রী, বেহুলার[6] চরিত্রে আমরা দেখতে পাই একাধিকবার কঠীন বাধা অতিক্রম করে, মহাশক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে নিজেদের অন্যমাত্রায় উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন। প্রমীলা চরিত্রে বীর্যবত্তার এই ক্ষণদ্যুতি নিমিষে হারিয়ে গিয়ে শৃঙ্গার ভাবনায় কবির আস্থা স্থাপন করা বিষয়টি আধুনিক বোধকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে।

কাহিনীর শেষ পর্যায়ে আমরা দেখি;

যুদ্ধে রামচন্দ্রের অনীহার কারণে পরিস্থিতির বদল ঘটেছে, যুদ্ধের ভার প্রমীলাকে আর বহন করতে হচ্ছে না। রাজপুরী তে পৌঁছেই অনভ্যস্ত যুদ্ধসাজ ত্যাগ করে ব্যাস্ত হয়ে মিলনোপযুক্ত সাজে সজ্জিত হওয়ার দৃশ্যটি প্রমীলার বীরাঙ্গনা ভাবের সাময়িক উন্মাদনা, আরোপিত বিষয় বলে মনে হয়। প্রমীলাকে বিকল্প সত্বা হিসেবে গুরুত্ব দেয়ার অবকাশ থাকে না। বিসর্জন বা অবসান পর্বে আমরা আরো লক্ষ্য করি কোন ব্যাক্তি বৈশিষ্ট্যের দাবি নিয়ে এই চরিত্র উপস্থিত হয়নি, বিশেষত্ব অর্জনের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। প্রমীলার। মেঘনাদের সঙ্গে অ-বিচ্ছিন্ন গ্রন্থিতে বাঁধা প্রমীলা স্বামীর অনুগমনে চিরাচরিত গরিমার মধ্যেই আশ্রয় খুঁজেছেন। প্রমীলা চরিত্রটিতে পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা ভেবে অনেক পাঠকই চমৎকৃত হয়েছে ঠিকই তবে তার সর্বসত্তায় দেশীয় ধর্মের এই পশ্চাৎপদতার চিহ্ন আমাদের চিন্তাকে বিপরীত মেরুতে দাড় করিয়ে দেয়। ' পতিগত প্রাণা নারী '- প্রমীলা। নারীর শুভশুভ সব কিছু পতিকে জড়িয়ে আছে এই আবহকালীন বিশ্বাসেরই এক জীবন্ত প্রতিরূপ প্রমীলা। প্রমীলা চরিত্রটি সর্বাঙ্গে আধুনিক বলে মনে হয় না।

বঙ্গালী প্রাণতা ও "সীতা" চরিত্র নির্মান

মধুসূদন সজ্ঞান ও সচেতন ভাবে ইউরোপীয় জীবনকে বরণ আর বাঙালী জীবনকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করতে চেয়েছেন তবে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তিনি ছিলেন গভীর বাঙালী অন্তপ্রাণ। এখঅনেই তাঁর দ্বৈত অনুভূতি প্রকাশ পায়। আর এই বাঙালী প্রাণতার মূলে রয়েছে সু-গভীর মাতৃভক্তি। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে সীতা চরিত্রটি নির্মানে মধুসূদনের বাঙালী প্রাণতা ও মাতৃভক্তির প্রভাব সুস্পষ্ট। কবি সীতার মাধ্যমে দুঃখিনী সকল বাঙালী নারীর প্রতি তাঁর আবেগ ও অনুভূতি উজাড় করে দিয়েছেন। মধুসূদন রচীত সীতা চরিত্রটি হতভাগিনী মা ও বাঙালী নারির প্রতিভু। মেঘনাদ বধ কাব্যে কবির আকণ্ঠ ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে রঘুকুলের প্রতি অথচ রঘু কুলবধু সীতার প্রতি কবি অন্তরের সকল ভক্তি শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন। চিত্র উপস্থাপন ও চরিত্রায়ন এই দুইয়ের মধ্যে সীতা চিত্র উপস্থাপনাতেই বেশি ছিলেন। চরিত্রায়নের গৌরব এই কাব্যে সীতা চরিত্রে নেই, অশোক বনে তিনি বহুদিন বন্দিনী আছেন। মহাযুদ্ধের নিত্য নৈমত্তিক প্রতিক্রিয়া থেকে বহুদুরে এক মহার্ঘ স্থির চিত্রের মতো। নবম সর্গে একবারই তাঁর উদ্ধার পার্বের শুরুতে রাবনপরিবারের বেদনায় তাঁকে আমরা কাতর হতে দেখি। বস্তুতঃ সরমা ছাড়া আর কারও কারও সঙ্গে সীতার আন্তঃ যোগাযোগ বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া গড়ে ওঠেনি।

"মেঘনাধবধ কাব্য"ও "বীরাঙ্গনা কাব্য" এই দুই কাব্য গ্রন্থ আলোচনায় পাঠকগনের অভিমত মদুসূদন নারী উজ্জীবন মন্ত্রে বিশ্বাসী। বাঙালী মেয়েদের প্রগতিশীল করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি একটি ভূমিকা হয়তো রাখতে চেয়েছিলেন। মধুসূদন চেয়েছিলেন মেয়েদের সামাজিক ঠাঁটের বদল হোক, আত্মচেতনায় অধিকার বোধে তাঁরা আরো চৌকস হয়ে উঠুক, সামাজিকতায় তাঁদের গমন আরো স্বচ্ছন্দ হোক।

চরিত্র চিত্রনের বিষয়টি তখনই স্বচ্ছ হয় যখন চরিত্রের স্বভাব ধর্ম ও বাহ্যিক ঠাঁট একই হয়, আর আধুনিকতায় মুক্ত বুদ্ধির, যৌক্তিকতার ছাপ থাকা জরুরি। মধুসূদন দেখেছেন এদেশে মেয়েদের অর্ন্তজীবনে এক ঔচিত্যের বোধ কাজ করে, ঐতিহ্যগত দিক থেকে যা ভারতবর্ষের নারীদের গর্বের বিষয়। এ কারণে প্রমীলার আত্মমর্যাদা বোধ প্রয়োজনে জাগ্রত হয়ে স্বভাব বশেই স্বামী কেন্দ্রিক প্রেম ময়তাকে জড়িয়ে থাকে। চিত্রাঙ্গদা প্রজার অবস্থানে দাড়িয়ে রাজা ও স্বামীর উদ্দেশ্যে অভিযোগ ছুড়ে দিয়েও ভাগ্যবাদকে মেনে নিয়ে অ-সহায়ের মতো কাঁদতে কাঁদতে রাজসভা থেকে বেরিয়ে যায়। এই দ্বৈততাকে মেনে নিয়ে নারী চরিত্রায়ণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংমিশ্রণের বিষয়টি মধুসূদনের বৈশিষ্ট্য বলে ভাবা হয়।

তবে "সীতা" চরিত্রটি কবির এই মানসিকতার সাথে মিল না রেখেই গড়ে উঠেছে। নারীর স্বভাব ধর্মের সন্ধান করতে গিয়ে মধুসূদন সীতার মধ্যে কেবলই সহিষ্ণুতা, নমনীয়তা, করুর্ণাধর্ম ও মাধুর্যের সন্ধান করেছেন। মায়ের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা মধুসূদনের মনোজগতে নারী ধর্মের ভারতীয় মনষ্কতাই প্রভাব ফেলেছে বলে আমরা ধারণা করতে পারি। সাগরদাড়ি গ্রামে মায়ের তত্ত্বাবধানে মধুসূদন বেড়ে উঠেছেনে ও শিক্ষালাভ করেছেন, পিতা রাজ নারায়ন দত্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গঁ হতে পারেন নি, পিতার ব্যক্তিত্বের কারণে। একমাত্র সন্তান মধুসূদন ধর্মান্তরীত হওয়ায় পিতা রাজ নারায়ন দত্ত ধর্মত: পুত্রহারা হন। এবং পুত্র লাভের আশায় তিন তিনবার বিয়ে করনে। স্বামীর এই নিষ্ঠুর আচরণের ফলে মাতা জাহ্নবী দেবী ব্যাথিত হন। মধুসূদন মায়ের দুঃখ উপলদ্ধি করে সমস্ত বাঙ্গালী নারীর দুঃখ বুঝেছেন। আবহমান কালের বাঙালী হিন্দু নারী সর্বংসহা। বহুকালের ধর্ম ও সমাজের নিমর্ম নিষ্পেষনে হিন্দু নারীর জীবন দুবির্ষহ। নারীকে তাই আত্নরক্ষার তাগিতে নিরব হয়ে যেতে হয়, একটি ব্যুহ করে নিতে হয়, হতে হয় সহনশীল, তার কোন অভিযোগ থাকতে নেই।

চতুর্থ সর্গের প্রথমেই দেখা যায় সরমা সীতার সিঁথিতে সিদুঁর পরিয়ে দিচ্ছেন। সীতা চরিত্র পরিকল্পনায় কবির ভক্তি ও বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিকতার প্রতি অনুরাগী কবির এই হিন্দুয়ানী আচরণের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস আমাদের এই ধারণাই দেয় যে তিনি চিরায়ত সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। চতুর্থ সর্গের স্মৃতি বাহিত কাহিনীতে সীতার চার থেকে পাঁচবার চেতনা হারানো কথা আছে। প্রতিরোধহীন অসহায় নারী গর্জনে ও রণনাদে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাওয়া তাঁর চরিত্রের সহজ বৈশিষ্ট্য। পতিব্রতা নারীর মধ্যে সত্যব্রত্যের যে তেজ বিচ্ছুরিত হয় 'সীতা' চরিত্রে আমরা তা দেখতে পাই না। মধুসূদন পাঠককে

---

[6] সাবিত্রী- মহাভারত চরিত্র, যিনি যমের হাত হতে স্বামী সত্যবানকে রক্ষা করেছিলেন প্রেম ও সাহসিকতা দিয়ে। বেহুলা- মনসামঙ্গঁল কাব্যের প্রধান চরিত্র, লখিন্দরের স্ত্রী।

এইটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রতিরোধে সামর্থহীন হলেও গুণধর্মে ও ঔচিত্যবোধে সীতাকে তাঁর ধর্ম ও সংস্কার থেকে বিচ্যুত করা যায় না। সীতা চরিত্রের দেবী স্বভাবই মধুসূদনের উপজীব্য বলে মনে হয়। এ কারণে সীতার স্বপ্নবিলাস, রোমান্টিকতা এবং সুখাদর্শের বিশিষ্টতাকে দেবী বৈশিষ্ট্য হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

পার্থিব রূঢ়তায় স্বপ্নভঙ্গের বেদনা সীতাকে স্পর্শ করে না। গোদাবরী তীরে স্বর্গসুখ ঘেরা দাম্পত্য থেকে তাঁকে বিচ্যুত করে ছিনিয়ে আনল যে তস্কর রাবন, তাকেও সীতা ধীক্কার জানাতে চান না। আশোক বনকে এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন তা সহমর্মীতা ও স্বপ্ন গুঞ্জরণের তীর্থ। বিষয়টা অনেকটা এরকম যে দেবী সীতা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, পরিবেশটি তাঁর স্বভাব ধর্মের অনুকূলে থাকতে হবে। এ কারণে দেখা যায় “অশোক বন” পর্বের সূচনা হয়েছে সিদুঁর কৌটো হাতে সরমার অনু-প্রবেশের মধ্যদিয়ে সধবা সীতার সিঁথিতে সিঁদুর দেয়ার উদ্দেশ্যে, এই আবহের মধ্যে পবিত্রতার একটি বিষয় আছে বলে কবি মনে করেছেন। তাই এমন কোন প্রসঙ্গ আনেননি যা এই পবিত্র পরিবেশের বিঘ্ন ঘটাতে পারে। সীতা রাজনন্দিনী ও রাজবধু হওয়া সত্বেও উচ্চভিলাষী অহংকারী, দাপুটে মনোভাব তার মাঝে নেই। স্বেচ্ছা নির্বাসিত হয়ে সীতা বনবাসের জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করেছেন এবং সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ ঘরের মেয়ের মতো বনবাস সময়কে মাধুযর্ময় করে তুলেছেন স্বর্গীয় গুণে। দন্ডক অরণ্যে নির্বাসিত সীতা এবং আশোক বনে বন্দিনী সীতা এ দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেখা যায় না। নির্বাসনের জীবনকে যেমন তিনি অনায়াসে গ্রহণ করেছেন তেমনি স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে পঞ্চবর্টী বনের সরল জীবন বর্ননা করেছেন,

পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি বর্ণিব
সে কান্তার কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু।

সুখ মানুষের একটি মানসিকতার বিষয়, অনাড়ম্বর জীবনে কেবল প্রীতি দিয়েই স্বর্গ রচনা করা সম্ভব এই সত্যজ্ঞান সীতার বক্তব্যে উৎসাহ সহকারে ব্যক্ত হয়েছে। সেই উৎসাহে আছে আত্ম-প্রসাদের বীজমমন্ত্র, ও কৃতার্থতা। সীতার এই বর্ণনায়, ক্রন্দনে এমনই অভিভূবতা ছিল যে, রাক্ষস রাজবংশের ঘরণী সরমা রাজভোগ- ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছেন,

শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি
ঘৃণা জন্মে রাজাভোগে, ইচ্ছা করে, ত্যাজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলে হেন বনবাসে,
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।

সরমার এই ইচ্ছা প্রকাশের শেষে এক ভয়ের প্রসঙ্গঁ এসেছে। এই ভয় সাধারন অনাড়ম্বর বনবাস জীবনকে নিয়ে। যেখানে প্রাসাদের স্বাচ্ছন্দ্য নেই, সরমা ও সীতার মধ্যে সীতার অনন্যতা উপস্থাপনের জন্যই বিষয়টির অবতারণা বলে মনে হয়। মধুসূদন সীতাকে কেন্দ্রে রেখে পঞ্চবর্টী বনের মধ্যে এক রোমান্টিক প্রেম-পটভূমির কল্পনা করেছেন।

সীতার স্মৃতি কথনের দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে রাবণ কতৃক ‘সীতা’ অপহরণের ঘটনা। রাবণ অপরাধী তস্কর। তবে এই বিষয়ে সীতার ভাষ্য নিরপেক্ষ। সমগ্র কাব্যে মারীচ এর আত্ম প্রকাশ থেকে শুরু করে সীতার অশোক বনে প্রেরিত হওয়া পর্যন্ত সীতার বর্ণনায় রাবণকে “নির্দোষ” বলার চেষ্টা যা সীতা চরিত্রটিকে স্পষ্ট করেছে। ‘গরুড়’ রাবণের গতিপথ রোধ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিল, “ঘরে ঘরে রমণীহরণ রাবণের নিত্য কর্ম ’ এ বক্তব্যে সীতার কোন সায় ছিল না। আবার সরমা যখন বলে-সীতার নিরাভরণ দশার জন্য তার ভাশুর রাবনই দায়ী, অর্থাৎ সীতার অলঙ্কার রাবণ তস্করের মতোই হরণ করেছে। তখন সীতার বক্তব্য,

বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুমুখি
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী ধরিল আমাকে বনাশ্রমে।

যার কারণে সীতার এই বন্দী দশা পরিণতি, তাকে অভিযুক্ত করার সুযোগ উপক্ষো করার মধ্য দিয়ে সীতা চরিত্রের অ-খন্ডতা প্রকাশ পায়। সে কাউকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করতে চায় না।

যুদ্ধ সম্পর্কিত কোন সংবাদ সীতার কাছে পৌছানোর কোন উপায় নেই, তবুও এ বিষয়ে সীতার কোন উদ্বেগ আমরা লক্ষ করি না। মধুসূদন সীতা চরিত্রটি স্থায়ী সস্তির রূপক হিসেবে কল্পনা করেছেন। পরিস্থিতির চাপে ভীত সন্ত্রস্ত্র সীতা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে তাঁর অবশ চেতনায় ধরীত্রিমাতা এক স্বপ্নদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন সীতা মানসচক্ষে দেখেছেন, রামের সঙ্গে পরিনামী যুদ্ধে রাবণ ভূতলে গড়াগড়ি করছেন। এই স্বপ্নেই সীতা যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে ধারণা করেন এবং নিজের উদ্ধারের বিষয়ে নিশ্চিত হন।

চতুর্থ সর্গে দেখা যায়। ভাগ্য কে দোষ দিয়ে সীতার আত্ম জবানবন্দী, যা নিয়ত অশ্রুক্ষরণে সিক্ত। অশোক বনের সেই অনন্য পরিবেশ যেখানে বৃক্ষলতা; পশুপাখির অনু-কম্পনও আমাদের চোখে পড়ে। আবার নবম সর্গে দেখা যায় স্বভাব দ্রবময়ী সীতার সমব্যাথী চিত্ত। প্রমীলার স্বামী সহমরণ যাত্রাকালে অকালে ঝরে পড়া নারী সুষমার ব্যাথায় ছোট বড়, পক্ষ প্রতিপক্ষ সকলেই সমব্যাথী সীতাও তার আত্ম বিস্মৃত পরিক্রমার পরিধি থেকে বেরিয়ে এসে বর্তমান ব্যাথাময় ঘটনায় সমব্যাথী হলেন। সীতা তার শুভদিন সূচনা লগ্নে সমবেদনা নিয়ে সামনে এসে দাড়ালেন। পরম শত্রুর পারিবারিক নিঃস্বতা আর প্রমীলার স্বপ্নময় জীবনের অকাল অবসানের জন্য সীতা নিজেকেই দায়ী করেন এবং সখী সরমার কাছে সে কথা বলেন। “রঘু বংশের সর্বনার্শের কারণ সীতা, তাঁর অক্যালণ স্পর্শেই সমৃদ্ধময় লঙ্কার দুর্দিন” সীতার এই আত্মভাষণকে কৃত্রিম বলে মনে হয় না। মধুসূদন সদা চেষ্টা করেছেন সীতাকে মরমী বেদনার ও সহানুভূতির গুণধর্মে ঐশ্বর্যময়ী করে চিত্রায়ন করতে।

উপসংহার

প্রমীলা ও সীতা মধুসূদনের যুগপৎ রচনার দু'টি ধারা, সমকাল বিবেচনায় একটি বিকাশিত হওয়ার পথে অপরটি অবলুপ্তির দাবিদার। একটি উনিশ শতকের নব জাগরণের ফলে শিক্ষিত আলোকিত সমাজ ব্যাক্তিত্বের প্রকাশে আশা জাগানিয়া, অপরটি আবহমান চিরায়ত পশ্চাতমুখি। একটি ধনাত্মক, অপরটি ঋণাত্মক। ‘প্রমীলা’ চরিত্রটি মধুসূদন সৃষ্টি করেছেন সচেতন ভাবে, তাঁর রুচি ও বক্তব্য প্রকাশের নিরিখে। ‘প্রমীলা’ চরিত্রটি বিশ্লেষণে পর্যালোচনে যদিও আধুনিক কবি রচিত অখন্ড চরিত্র বলে মনে হয়নি, তবুও বলা যায়, উনিশ শতকের মধ্যাহ্নে বাঙালী নারীকে

নবজাগরণে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছেন কবি। কেবল ত্যাগের পানে নয়, নিজের অধিকার, প্রাপ্য ন্যায্য হিস্যা, তথা ভোগের পথেই পরিচালিত করতে চেয়েছেন কবি মধুসুদন, আর প্রমীলা চরিত্রটি এই পথ- পরিক্রমার অভিযাত্রী। সীতা চরিত্রটি মধুসূদনের শ্বাশত বাঙ্গালী মনের সৃষ্টি বলে মনে করা যেতে পারে, চরিত্রটি ‘প্রমীলা’ চরিত্রটিকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। মধুসূদন সজ্ঞান ও সচেতন ভাবে যুরোপীয় জীবনকে বরণ এবং বাঙালী জীবনকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করতে চেয়েছেন, অথচ অতঃস্থলে ছিল বাঙালী প্রাণতা, এর কারণ বেড়ে ওঠার পারিপার্শ্বিক প্রভাব এবং পারিবারিক শিক্ষা।

পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, বিদেশী ভাষায় কাব্যরচনায় অসফল হয়ে মধুসূদন কোন ভিনদেশী কাব্য দেশী ভাষায় রচনা করেন নি। যুগধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি ভারতীয় ও অভারতীয়ত্বকে সমমর্যাদায় গ্রহণ করেই তার যথোচিত সমীকরণ ঘটিয়েছেন এবং বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকতার পথে বিকশিত হওয়ার পথ তৈরি করে দিয়েছেন।

তথ্য সংগ্রহঃ

[1] ১. অধ্যাপক অমূল্য বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ।*
[2] ২. শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *মধুসূদন: কবি ও নাট্যকর ।*
[3] ৩. মোবাশ্বের আলী, মধুসূদন ও নব জাগৃতি ।
[4] ৪। গোলাম মুরশিদ, *আশার ছলনে ভুলি* (২য় মুদ্রন ২০০৮)।
[5] ৫. ড: হুমায়ুন আজাদ, *লাল- নীল দীপাবলী ।*
[6] ৬। ড: জয়ন্ত বন্দোপাধ্যায় ও ড: পুষ্পেন্দু শেখর গিরি, *মেঘনাদবধ কাব্য বিকল্প পাঠ ।*